চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড': আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান

চীন অবকাঠামোগত যোগাযোগ পরিকল্পনা 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (ওবোর)-এর মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রায় ৭০টি দেশের সাথে সড়ক, রেল ও নৌপথের সংযোগ তৈরি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০১৩ সালে ওবোরের ধারণাটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় আনেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত চীনের এই মহাপরিকল্পনা নিয়ে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে নেই। আর ভারত ও চীন–এ দুই দেশই নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ায় আঞ্চলিক রাজনীতি ও সামরিক-কৌশলগত কারণে এবং নিজস্ব ও বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তবতায় চীনের ওবোর ধারণাটি বাংলাদেশকে উভয় সংকটে ফেলে দিয়েছে। এ সব কিছু বিবেচনায় এই লেখাটিতে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে। যেমন– চীন কোন বাস্তবতায় ওবোর পরিকল্পনাকে সামনে আনল? ওবোর নিয়ে ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের অস্বাচ্ছন্দ্য কেন এবং তারা কী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে? আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ওবোর কী প্রভাব ফেলতে পারে ভবিষ্যতে? বাংলাদেশের জন্য ওবোরের তাৎপর্য কী?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য এই লেখাটিকে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ওবোরের ধারণার প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ ও তাদের প্রতিক্রিয়া, চতুর্থ ভাগে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ওবোরের সম্ভাব্য প্রভাব এবং পঞ্চম ভাগে অন্য ভাগগুলোতে আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য কী তাৎপর্য এই মহাপরিকল্পনার তার ওপর আলোকপাত করা হবে। উপসংহার টানার মধ্য দিয়ে লেখাটি শেষ হবে।

ক. কেন চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (ওবোর) এর পরিকল্পনা

চীনের ওবোরের পরিকল্পনাকে কেন, এটা বুঝতে গেলে দুটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া জরুরি। একটা হল তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতা আর অপরটি তাদের বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষা।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা : চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রফতানি আয় একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। এ দুই স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করেই তারা এখন উদ্বৃত্ত মূলধনের রাষ্ট্র। অন্যদিকে চীন ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, তা মূলত উপকূলীয় অঞ্চল কেন্দ্রিক। ফলে চীনের উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় চীনের অ-উপকূলীয় অভ্যন্তরীণ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে চীন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে এই অঞ্চলগুলোর অবকাঠামোগত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যা 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি' নামে পরিচিত (ঝেং ও জিয়াং, ২০১১, পৃষ্ঠা-২)। 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'-এর মাধ্যমে এই অঞ্চল যোগাযোগ অবকাঠামোগতভাবে এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের সাথে ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য সংযুক্ত হবে।

আর যেহেতু চীনের বাড়তি মূলধন রয়েছে, তা বিনিয়োগ করতে পারবে অবকাঠামো নির্মাণে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী উন্নয়নশীল এশিয়াতে বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য ২০১৬-২০৩০ সালের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে বছরে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন (এডিবি, ২০১৭)। আর এই বিনিয়োগ জোগান দেয়ার ক্ষমতা আসলে এখন চীনেরই আছে। আগে অবকাঠামোগত উন্নয়নে অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বিশ্বব্যাংক। এখন কিন্তু অবকাঠামো উন্নয়নে তাদের বিনিয়োগ অনেক কমে এসেছে। যেমন– ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে বিশ্বব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের ৭০% ছিল অবকাঠামো খাতে, যা ১৯৯৯ সাল নাগাদ কমে দাঁড়িয়েছে ১৯%-এ (লিয়াং, ২০১৯, পৃষ্ঠা-৩৭০)। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রেও এই একই প্রবণতা। তাই ওবোর চীনের জন্য বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করছে। ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে তাদের সরকারি হিসাব অনুযায়ী কারেন্ট অ্যাকাউন্টে উদ্বৃত্ত ছিল ৮৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (রয়টার্স, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। উপরন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিকাশমান অঞ্চল হিসেবে এশিয়া এখন সবচাইতে বেশি সম্ভাবনাময় এবং আকর্ষণীয়।

তাই চীনের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাদের যে উদ্বৃত্ত মূলধন, তা তো বিনিয়োগ করতে হবে। অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আবার চীনের কিছু বৈশিষ্ট্য মনে রাখা প্রয়োজন। যেসব জায়গায় চীন অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হচ্ছে, সেই দেশগুলোকে চীনের প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার করতে হয়, তেমনি মোটাদাগে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সেই দেশের, শ্রমিকও আনতে হয় সেখান থেকেই। তাই এই ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ শুধু তাদের বিনিয়োগের নতুন খাত নয়, বিদেশে তাদের শ্রমিকের কর্মসংস্থানের একটি বড় খাতও বটে। উপরন্তু চীন তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দেশীয় উন্নয়নের এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে, তাতে তাদের উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগের নতুন নতুন খাতের অনুসন্ধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে গত কয়েক বছর ধরে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য তাদের নেতৃত্বে অবকাঠমোগত উন্নয়নকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করার জন্য চীন এখন অনেক বেশি তৎপর। চীন তাই অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন– এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও গড়ে তুলেছে। এসবের মধ্য দিয়ে চীন যে বিনিয়োগটা করছে, তা হচ্ছে ঋণ। ওবোর প্রকল্পে যারা আওতাভুক্ত হচ্ছে, তারা চীন থেকেই বাণিজ্যিক শর্তে ঋণ নিচ্ছে বা নেবে। এই ঋণের মাধ্যমে চীন তার নিজের বিনিয়োগের লাভটা নিশ্চিত করতে পারছে। এর মধ্য দিয়ে চীন তাদের বিনিয়োগের নিরাপত্তার জন্য সামরিক কৌশলগত সুবিধাটাও তৈরি করছে। তাই চীন প্রকাশ্যে দাবি করুক বা না করুক, ওবোরের সামরিক কৌশলগত গুরুত্বকে আলোচনার বাইরে রাখা যায় না। অন্য কথায়, অর্থনৈতিক স্বার্থকে

নিরাপদ রাখতে হলে চীনের পক্ষ থেকে ওবোরের মাধ্যমে সামরিকায়নের সম্ভাবনাকে একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না।

বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষা : ২০১৫ সালের দিকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব, সেই সময় দ্বাদশ ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সময় চায়নিজ প্রিমিয়ার লি কেকিয়াং নিশ্চিত করেন যে, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় চীনের কৌশল হল 'বৈশ্বিক হয়ে ওঠা' (দ্য স্টেট কাউন্সিল অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব চায়না, ২০১৫)। তার মানে হল, চীন তার নিজের সনাতনি গণ্ডিতে আটকে থাকার খোলস ছেড়ে প্রভাববলয়ের দিক থেকে বৈশ্বিক হয়ে উঠবে অদূর ভবিষ্যতে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই চীনের ব্যবসা, নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো বাইরের দেশগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে অংশীদারত্বে লিপ্ত হচ্ছে। ওবোর এদিক থেকে চীনের জন্য কৌশলগত সুবিধাও নিশ্চিত করছে।

একইভাবে চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ওবোর নিয়ে বিভিন্ন কনফারেন্সে আলোচনায় কিংবা তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে যে বিষয় নিশ্চিত করতে চাইছেন সেটি হল, 'এশিয়া ফর দি এশিয়ান' (বাজপেয়ি, ২০১৪)। অর্থাৎ চীন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে এশিয়া অঞ্চলে তার সামরিক ও কৌশলগত আধিপত্য নিশ্চিত এবং একটা প্রভাববলয় তৈরি করতে চাইছে। যার ফলে ওবোরকে বুঝতে গেলে যেমন চীনের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিতে হয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীনের 'গ্লোবাল' হওয়ার লক্ষ্য এবং এশিয়াতে সামরিক-কৌশলগত প্রভাববলয় তৈরি করার প্রচেষ্টা। বস্তুত ওবোরের চারটি অবকাঠামোগত স্তম্ভের মধ্যে একটি হল জ্বালানি-পরিবহন অবকাঠামো। জ্বালানি-পরিবহন অবকাঠামো ওবোরকে একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, যা এর সামরিক কৌশলগত গুরুত্বও নিশ্চিত করেছে। অন্য স্তম্ভগুলো হল সমুদ্রপথ, সড়কপথ আর আকাশপথে অবকাঠামোগতভাবে যোগাযোগ সংযুক্তি।

> ঠিক একইভাবে সমুদ্রবন্দরকে ঘিরে চীন যে অবকাঠামো গড়ে তুলছে, যাকে বলা হচ্ছে 'স্ট্রিং অব পার্লস', সেটাকে কেন্দ্র করে ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে; বিশেষ করে আমরা যদি পাকিস্তানের গোয়াদারে, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটায়, মিয়ানমারের কায়াকপুতে বন্দর নির্মাণের ধরনটা বুঝি। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের পায়রা বন্দর

খ. ওবোর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিক্রিয়া

'এশিয়া ফর দি এশিয়ান'–এই কথাটা যখন চীন বলেছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই এটার মাধ্যমে চীন একটা নিজস্ব প্রভাববলয় তৈরি করতে চাইছে। যেহেতু চীনের প্রভাববলয় তৈরি হচ্ছে ওবোরের মধ্য দিয়ে, তাই বিশ্বব্যবস্থার শক্তিকাঠামোতেও একটা পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তিকাঠামো, তা দুর্বল হয়ে ওঠার এটা একটা লক্ষণ। তাই যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কাগ্রস্ত না হয়ে পারে না। এজন্য চীনের বিকাশমান আধিপত্যতে অস্বস্তিতে থাকা যুক্তরাষ্ট্র সরাসরিই বলেছে যে ওবোর শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নয়, এটা এক রকমের 'ট্রোজান হর্স' (চ্যাডস্কি ও ম্যাক ব্রাইড, ২১ মে ২০১৯)। যুক্তরাষ্ট্রও চেষ্টা করছে ওবোরের বিকল্প কিছু সামনে আনার জন্য, যাতে চীনের সাথে অন্য রাষ্ট্রগুলো জোটবদ্ধ হতে না পারে। আর তার অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে মার্কিন প্রশাসন কংগ্রেসে 'বেটার ইউটিলাইজেশন অব ইনভেস্টমেন্টস লিডিং টু ডেভেলপমেন্ট' (বিইউআইএলডি/BUILD) অ্যাক্টটি পাস করে (যেঙ্গারলে, ৪ অক্টোবর ২০১৮)। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এটা এখন আইনে পরিণত হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কর্পোরেশন' নামের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। এই প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে ৬০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করতে চায় উন্নয়ন খাতে (পিলিং ও পলিটি, ৪ অক্টোবর ২০১৮)।

শুধু তাই নয়, এশিয়ায় চীনের প্রভাব কমানোর চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এর নাম হল 'এশিয়া রিঅ্যাশিউরেন্স ইনিশিয়েটিভ অ্যাক্ট' বা এরিয়া/ARIA। এটা হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সিনেটে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে পাস হয়েছে। এই আইনের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী পাঁচ বছর ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গড়ে ১.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারবে (পান্ডে, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯)। এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, চীনকে ঘিরে তাদের যেমন রয়েছে সামরিক কৌশলগত উদ্বেগ, তেমনি রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে ঘিরে অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছে তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর ক্রমান্বয়ে চীনমুখী হওয়ার প্রবণতা নিয়ে।

গ. ওবোর নিয়ে ভারতের অস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিক্রিয়া

এককথায় বলতে গেলে চীনকে নিয়ে ভারতও খুব আশঙ্কাগ্রস্ত। এর যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাববলয় মোটাদাগে এশিয়ামুখী। তার ওপর দক্ষিণ এশিয়া হল চীনের প্রতিবেশী অঞ্চল। চীনের সাথে সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে ভারত, নেপাল, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের। বাংলাদেশও খুব দূরে নয়। তাই একদিকে চীনের যেমন অঞ্চলভিত্তিক প্রভাববলয় তৈরির প্রচেষ্টা আছে, ঠিক একইভাবে চীনের একটি বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার প্রবণতাও রয়েছে। অন্যদিকে ভারতও আঞ্চলিক ও বিশ্বশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এ দুই দেশের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আকাঙ্ক্ষাগত দিক একই রকম হওয়ায় তারা একে অপরকে নিয়ে আশঙ্কাগ্রস্ত। তাই কোন কোন পর্যায়ে ভারত-চীনের মধ্যে যেমন তুমুল সহযোগিতা বিরাজ করলেও দেশ দুটি নিজেদের মধ্যে চরম প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত।

বিশেষ করে ওবোরের চারটি করিডর নিয়েই ভারতের উদ্বেগটা অনেক বেশি। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চীনের এই প্রবণতাকে লক্ষ্য রেখে পররাষ্ট্রনীতিতে 'প্রতিবেশীই প্রথম' নীতি গ্রহণ করেছেন। আমরা অর্থনৈতিক বা অবকাঠামো ক্ষেত্রে চীনের বিনিয়োগের যে বিস্তৃতি দেখছি, তার শুরুটাও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে ঘিরে। এই দুই দেশই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর তাদের নিজেদের প্রভাববলয়টা নিশ্চিত করতে চাইছে। এ কারণেই ওবোরের চারটি করিডর নিয়ে ভারত খুবই উদ্বিগ্ন। সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার ইকোনমিক করিডর, চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর, ট্রান্সহিমালয়ান ইকোনমিক করিডর, যা শুরুতে ছিল চীন-নেপালকে ঘিরে এবং মেরিটাইম সিল্ক রোড।

তবে এই মেরিটাইম সিল্ক রোড ভারতের জন্য বেশি স্পর্শকাতর। কেননা ভারত মহাসাগরের ওপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ জরুরি তাদের আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য। আবার মালাক্কা প্রণালির জন্য ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব চীনের কাছে অনেক বেশি। কেননা মালাক্কা প্রণালি চীনের বাণিজ্য ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম প্রধান নৌপথ। চীনের ভয়, ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন ধরনের দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হলে মালাক্কা প্রণালিকে ঘিরে সামরিক সংকট তৈরি হতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন, এই সংকট যেন ভবিষ্যতে দেখা না দেয়, সেজন্য চীন এই মেরিটাইম সিল্ক রোডের ধারণাটা সামনে এনেছে। এর মাধ্যমেই ভারত মহাসাগরে তাদের আধিপত্য সম্ভব। ঠিক একইভাবে সমুদ্রবন্দরকে ঘিরে চীন যে অবকাঠামো গড়ে তুলছে, যাকে বলা হচ্ছে 'স্ট্রিং অব পার্লস', সেটাকে কেন্দ্র করে ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে; বিশেষ করে আমরা যদি পাকিস্তানের গোয়াদারে, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটায়, মিয়ানমারের কায়াকপুতে বন্দর নির্মাণের ধরনটা বুঝি। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের পায়রা বন্দর (দত্ত, ১৫ জুন ২০১৭)। ইতোমধ্যে হর্ন অব আফ্রিকা আর ভারত মহাসাগর সংলগ্ন জিবুতিতে চীন একটি সামরিক নৌঘাঁটি স্থাপন করেছে। চীনের অর্থায়নে আফ্রিকায় নির্মিত বা নির্মিতব্য ৪৬টি বন্দরের মধ্যে ১১টি বন্দর তারা নিজেরাই পরিচালনা করছে বা করবে (ডেভারমন্ট, ৪ জুন ২০১৯)। ভারত মহাসাগরকে ঘিরে ভারতের চারদিক দিয়ে এভাবে বন্দর নির্মাণ ভারতকে নিরাপত্তা শঙ্কার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

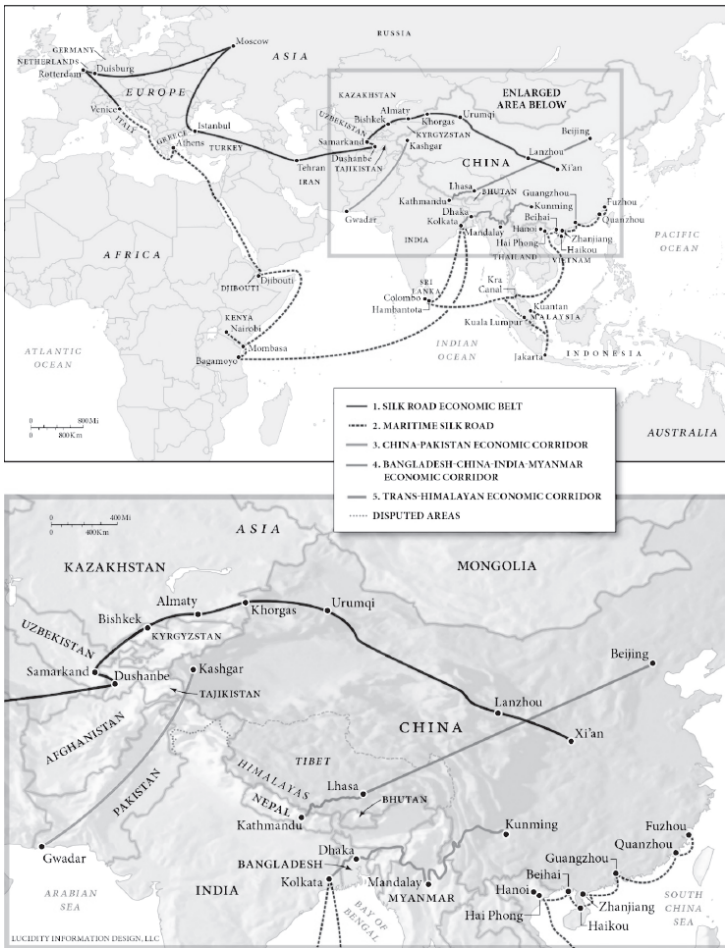

মানচিত্র : চীনের ওবোর ও থাইল্যান্ডের ক্রা খাল (উৎস : বাড়ুয়া, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪)

আবার মেরিটাইম সিল্ক রোডের আওতায় চীন থাইল্যান্ডের ক্রা নামের একটা যোজকে নৌপরিবহনের জন্য একটি খাল খননের পরিকল্পনা করেছে। এই খাল মালাক্কা প্রণালির বিকল্প হয়ে যাবে চীনের জন্য (মেনন, ৬ এপ্রিল ২০১৮)। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এই খাল দিয়ে চীনের সাথে ভারতের নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব কমে আসবে এবং সহজেই চীন সেখানে পৌঁছতে পারবে (বাড়ুয়া, ২১ আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৩)।

এ সব কিছু বিবেচনায় ভারত চেষ্টা করছে চীনের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার। তাই তারাও ভারত মহাসাগর সংলগ্ন যে দেশগুলো রয়েছে, সেইসব দেশের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে ভারত সিঙ্গাপুর, ওমান, সিসিলি, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে উপকূলীয় নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় কোস্টাল সারভেইল্যান্স রাডার সিস্টেম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত একই রকম চুক্তি সেশেইলস্, মরিশাস, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার সাথেও করেছে (দ্য হিন্দু বিজনেসলাইন, ৯ জুন ২০১৯)। এ সব কিছুর বড় কারণটাই হচ্ছে ভারত মহাসাগরে চীনের আধিপত্য ঠেকানো। এজন্য ভারত একটা সার্বিক পরিকল্পনাই নিয়েছে। এটাকে তারা বলছে 'সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ অব অল ইন দ্য রিজিয়ন' বা সাগর/SAGAR। এই পরিকল্পনার আওতায় ২০৩৩ সাল নাগাদ ২৫টি দেশের ২১টিকে সংযুক্ত করতে চাইছে ভারত (কাপুর, ৩ জুন ২০১৯)।

মোটাদাগে এ সব কিছু এটা নির্দেশ করছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় এক ভিন্ন ধরনের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে ভারত ও চীনের মধ্যে, যদিও এটা কোন মতাদর্শিক প্রতিযোগিতা বা লড়াই নয়। এটা পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক আর ব্যাবসায়িক স্বার্থকে ঘিরে সামরিক কৌশলগত প্রভাববলয় বিস্তারের প্রতিযোগিতা। ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে চীনকে মোকাবিলা করার জন্য। এক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে জাপানকে বেছে নিয়েছে। কেননা ভারত মহাসাগরকে ঘিরে জাপান ও ভারতের নিরাপত্তাগত শঙ্কা একই রকম। দক্ষিণ চীন সাগর বাণিজ্যিক নৌপথ হিসেবে জাপানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। আবার পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত সেনকাকু/দিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে রয়েছে চীনের সাথে তাদের বিবাদ (লিয়াও, ১৭ এপ্রিল ২০১৮)। তাই ভারত ও জাপানের মধ্যে ভারত মহাসাগরে চীনবিরোধী ঐক্য তাদের উৎসাহিত করেছিল আফ্রিকা ও দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার ১৭টি দেশের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ সংযুক্তির জন্য, ২০১৭ সালে এশিয়া-আফ্রিকা ইকোনমিক করিডর গঠনের মাধ্যমে। যদিও এটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৫ মে ২০১৭)। চীনের অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাবের কারণে এটা শেষ পর্যন্ত মেরিটাইম সিল্ক রোডের বিকল্প হতে পারবে কি না তা সময় বলবে অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে। জাপানের 'নিসিন' নামের একটা বহুজাতিক খাদ্য-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে চীনের কাগোমি কোম্পানির সাথে

যৌথভাবে ব্যবসা করছে (কয়নে, ২৩ এপ্রিল ২০১৮)। শুধু তাই নয়, জাপান সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সাথে ৩০ বিলিয়ন ডলারের মুদ্রা বিনিময় চুক্তিও করেছে (জিনহুয়া, ২৬ অক্টোবর ২০১৮)।

ঘ. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর ওবোরের সম্ভাব্য প্রভাব

ওবোর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভূ-রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে নিশ্চিতভাবে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাস্তবায়িত হলে। কেননা চীনকেন্দ্রিক যোগাযোগ সংযুক্তি আর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই অঞ্চলের ভৌত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যেও অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসবে আর এতে ভূ-রাজনীতিতেও নতুন নতুন মাত্রা যোগ হবে। ওবোরের পথরেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেগুলোতে অনেক সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল আছে। ভারত বেশি উদ্বিগ্ন বিশেষ করে অরুণাচল ও লাদাখকে নিয়ে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে সীমান্তগত কিছু অমীমাংসিত বিষয় থেকে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত আশঙ্কাগ্রস্ত যে এই ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে ভারতের যে সার্বভৌমত্বের দাবি, তা আর বিরাজ করবে কি না শেষ পর্যন্ত।

অন্যদিকে ওবোরের মধ্য দিয়ে যে মেরিটাইম সিল্ক রোড, তা একেবারে আফ্রিকার মধ্য দিয়ে ইউরোপের সাথে এশিয়ার বাণিজ্যপথ সংযুক্তি ও সম্প্রসারণের একটা প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে চীন তার নিজস্ব সামুদ্রিক অঞ্চলের বাইরেও তার আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগর সংলগ্ন জিবুতিতে চীনের যে সামরিক নৌঘাঁটি, তা এটা নির্দেশ করে। আবার থাইল্যান্ডের ক্রা খালটাও চীন খনন করতে সক্ষম হলে তা চীনকে সামুদ্রিক পথে সামরিক কৌশলগত সুবিধাও দেবে। তাই সমুদ্রের বা মহাসাগরের ওপর আধিপত্য চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আরও নিরাপদ করবে।

> ভারত সিঙ্গাপুর, ওমান, সিসিলি, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে উপকূলীয় নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় কোস্টাল সারভেইল্যান্স রাডার সিস্টেম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত একই রকম চুক্তি সিসিলি, মরিশাস, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার সাথেও করেছে।

ইতিহাসও তেমন কিছুর ইঙ্গিত দেয়। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে 'সুপারপাওয়ার' হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে সমুদ্র অঞ্চলেও মার্কিন নৌবাহিনী ব্রিটেনের আধিপত্যকে স্থলাভিষিক্ত করেছে। সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারের এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে চীনকে ঘিরে নতুন বাস্তবতা যে অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝাটা খুব সহজ। সব কিছুই দৃশ্যত নির্দেশ করছে চীন যেন 'মাহানীয় নৌকৌশল'কে পুনর্জীবিত করেছে 'মেরিটাইম সিল্ক রোডে'র মাধ্যমে (ব্রুস্টার, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৬২); যদিও চীন বরাবর তা অস্বীকার করে আসছে। মার্কিন নৌ কর্মকর্তা ও চিন্তক আলফ্রেড থায়ের মাহান (১৮৪০-১৯১৪) মনে করতেন, যে রাষ্ট্র ভারতীয় মহাসাগর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সেই রাষ্ট্র এশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে (প্রাগুক্ত)। তবে জিবুতি নৌঘাঁটি স্থাপনের কারণে চীনের আধিপত্যের এই অভিপ্রায়কে অনেকেই সত্য বলে মনে করছেন। বস্তুত এই ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে জিবুতিতে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান আর ফ্রান্সের নৌ-স্থাপনার কাছাকাছি চলে এসেছে চীন (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩)। তাই চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রভাববলয় বিস্তারের সাথে সাথে তার সমুদ্র অঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এজন্য অনেকেই মনে করছেন, ওই প্রবণতারই একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো 'মেরিটাইম সিল্ক রোড'। যদিও চীন এটা দাবি করে থাকে, তাদের এ সব কিছুই তাদের শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন বা 'পিসফুল ডেভেলপমেন্ট'। তারা তাত্ত্বিকভাবে প্রচার করে যে, এই ধরনের যোগাযোগ সংযুক্তি ও পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা কমাবে। এতে পৃথিবীটা আরও 'শান্তিময়' হবে।

ঙ. ওবোর ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

এখনকার অর্থনৈতিক বাস্তবতায় চীনকে উপেক্ষা করার অবস্থা আসলে কারোই নেই। যদিও জাপানও চেষ্টা করছে ভারতের সাথে একটা ঐক্য তৈরি করার, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরে চীনের আধিপত্য মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীনের প্রভাববলয়কে উপেক্ষা করা যাবে কি না সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ চীনের উদ্বৃত্ত-মূলধন নির্ভর অর্থনৈতিক শক্তি, যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত-মূলধন তো চীনকে বিনিয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রের বড় চেষ্টা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। সেই ক্ষেত্রে চীন বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রত্যাশিত। তাই এই বাস্তবতায় চীনকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য আসলে বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশে শি জিনপিংয়ের সফরকালীন ২৭টি প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ১৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল (প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০১৬)। শুধু তো বাংলাদেশ নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে ৬০টির বেশি রাষ্ট্র ওবোরের সাথে যুক্ত হচ্ছে, যা বিশ্ব জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশকে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করবে (চ্যাটস্কি ও ম্যাকব্রাইড, ২১ মে ২০১৯)। ফলে এই বাস্তবতায় আসলে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

আবার দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে চীন-ভারত প্রতিযোগিতার বাস্তবতা রয়েছে। যেমন রয়েছে সামরিক কৌশলগত প্রতিযোগিতা, তেমনি অর্থনৈতিক স্বার্থকে ঘিরে প্রতিযোগিতা। এখন বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হবে সেটা নির্ভর করবে চীন-ভারতের মধ্যে বিরাজমান এক ধরনের স্নায়ুযুদ্ধকে বাংলাদেশ কীভাবে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাবে। আর আঞ্চলিক পর্যায়ে এই ধরনের স্নায়ুযুদ্ধের সুবিধা-অসুবিধা দুটো দিকই আছে। কূটনৈতিক দর-কষাকষির জন্য এখন ভারত কার্ড ও চীন কার্ড–দুটি কার্ডই রয়েছে। এ দুই কার্ড নিয়ে কূটনৈতিক দর-কষাকষির একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মালদ্বীপ, নেপাল আর শ্রীলঙ্কার মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে এটা ঠিক, মতাদর্শবিহীন এই স্নায়ুযুদ্ধ বাংলাদেশকে দুই দেশের তরফ থেকেই আবার চাপের মধ্যে রাখছে।

এখন আঞ্চলিক পর্যায়ের এই স্নায়ুযুদ্ধের সুবিধাটা বাংলাদেশ কীভাবে নেবে এবং নিজেদের সুবিধাটা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারবে, তা আসলে নির্ভর করবে চীন-ভারতের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতায় রাষ্ট্র দর-কষাকষিটা কীভাবে করছে। এদিকে আরেকটা ঝুঁকি হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের তো এক ধরনের প্রভাব সব সময়ই

ছিল, বিশেষ করে ঐতিহ্যগতভাবে বর্তমানের ক্ষমতাসীন দলের সাথে। আর এখন চীনও দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন প্রভাববলয় তৈরি করার ক্ষেত্রে আগের চাইতে অনেক বেশি সক্রিয়। এর একটা নিদর্শনও আমরা দেখেছি বাংলাদেশের রাজনীতিকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে, যা আগে ওভাবে অতীতে দেখা যায়নি। ২০১৮ সালের 'বিতর্কিত' জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (দ্য ডেইলি স্টার, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮)। এটার কিন্তু প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে এবং খুবই কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার। কেননা কোন দেশের খুব অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে সরাসরি কোন মনোভাব প্রকাশের প্রবণতা সাধারণত চীন দেখায় না। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উল্টোটাই দেখা গেল। অর্থাৎ চীন-ভারত উভয়ই এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির গতিবিধি নির্ধারণে অনেক সক্রিয়।

আবার বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আর আগের মত শক্তিশালী অবস্থানে নেই। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি ভারতনির্ভর হয়ে উঠেছে। যার ফলে যে প্রভাবটা তাদের একসময় দক্ষিণ এশিয়ায় ছিল বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কার্ড হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে ব্যবহার করা যেত, এখন সেটা খুব ফলপ্রসূ নয় এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর জন্য। সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চীন অনেক প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এখন বাংলাদেশও অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করতে পারে। এরকম অনেক উদাহারণ আছে। আগে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা আমাদের কোন রাজনৈতিক নেতা, যারা ক্ষমতাসীন হত, তারা খুব সহজভাবে করত না। আর এখন সচরাচর দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা নিজেদের রাষ্ট্রের সাথে সহজেই তুলনা করছেন।

এখন যেই ক্ষমতায় থাকুক না কেন খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীন-ভারতকে তারা কীভাবে ম্যানেজ করছে। আর চীন-ভারতকে ম্যানেজ করার ওপর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ভাগ্য বোধ হয় নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে চীন-ভারতের আঞ্চলিক পর্যায়ে 'স্নায়ুযুদ্ধ' যেমন বাংলাদেশের জন্য কখনও কখনও সুবিধা তৈরি করেছে, আবার কখনও কখনও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অনেক চাপও তৈরি করছে। যেমন– ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগকে ঘিরে চীন-ভারতের মধ্যে যে টানাহেঁচড়া, তাতেই বোঝা যায় রাষ্ট্র কী রকম চাপে পড়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত চীনই বিনিয়োগের সুযোগ পায়। এছাড়াও চীন থেকে ২০১৬ সালে দুটি সাবমেরিন কেনার পর ভারতের নীতিনির্ধারণী মহলে যে প্রতিক্রিয়া, সেটা থেকেই বোঝা যায়, চীনের দিকে বাংলাদেশ যদি একটু হেলে যায়, সেটা ভারতের জন্য কতটা স্পর্শকাতরতা তৈরি করে। সাবমেরিন কেনার খবর প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিকর আর ভারতীয় সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের বাংলাদেশ সফর দিয়ে বোঝা গেছে তারা কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল! ভারতীয় অনেক নিরাপত্তা বিশ্লেষকও সেই সময় 'ক্রোধান্বিত' প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন (মাহমুদ, ২৩ জুলাই ২০১৯)। তাঁদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান অরুণ প্রকাশ অন্যতম। তিনি এই সাবমেরিন কেনার বিষয়টিকে বাংলাদেশ সরকারের একটা 'উসকানিকর্ম' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন (রাঘুভানশি, ২০১৬)।

আবার চীনের এই অবকাঠামোগত বিনিয়োগগুলো তো হবে ঋণ প্রদানের মাধ্যমেই। চীনের কাছ থেকে ঋণ নিলেও কখনও কখনও এক ধরনের ঋণ-ফাঁদ তৈরি হয়। এটা সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে দেখা গেল। ২০১৭ সালে ৯৯ বছরের জন্য তারা তাদের হাম্বানটোটা বন্দর চীনের কাছে লিজ দিয়ে দিতে বাধ্য হল (মোরামুডালি, ১৪ মে ২০১৯)। ঠিক একই ঘটনা জাম্বিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। চীনের এক্সিম ব্যাংক টুইট করে জানায় যে কেনেথ কাউন্ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিজেদের আয়ত্তে নিয়েছে (গ্রিন ওয়ারিয়রস, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯)। বস্তুত ২০১২-২০১৮, এই সময়ের মধ্যে আফ্রিকায় চীনের ঋণের পরিমাণ তিন গুণ বেড়েছে (মাডোও, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। ধারণা করা হচ্ছে, ঋণ আর অন্যান্য বিনিয়োগ থেকে চীন নিজেদের জন্য আফ্রিকা থেকে ২০২৫ সাল নাগাদ ৪৪০ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব নিশ্চিত করতে পারবে (জয়ারাম, কাসিরি ও সান, জুন ২০১৭)।

চীন থেকে ২০১৬ সালে দুটি সাবমেরিন কেনার পর ভারতের নীতিনির্ধারণী মহলে যে প্রতিক্রিয়া, সেটা থেকেই বোঝা যায়, চীনের দিকে বাংলাদেশ যদি একটু হেলে যায়, সেটা ভারতের জন্য কতটা স্পর্শকাতরতা তৈরি করে। সাবমেরিন কেনার খবর প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিকর আর ভারতীয় সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের বাংলাদেশ সফর দিয়ে বোঝা গেছে তারা কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল!

শেষ অভিমত

চীন তো আসলে এখন আর কোন মতাদর্শিক রাষ্ট্র না। চীন চরিত্র আর বৈশিষ্ট্যগতভাবে এখন ভীষণ মাত্রায় বণিক রাষ্ট্র। ইংরেজিতে যাকে বলে 'মার্কেন্টাইল স্টেট'। এই ধরনের রাষ্ট্রের যেহেতু কোন মতাদর্শিক বাধ্যবাধকতা নেই, তাই যে কোনভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করাটাই তাদের আসল কাজ। মতাদর্শিক ঐক্যের ভিত্তিতে কোন পরোপকারী বন্ধুত্ব ক্রিয়াশীল থাকে না বণিক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। তাই এটা বোঝা জরুরি, দেশে গণতন্ত্র অনুপস্থিত থাকলে বা গণতন্ত্রের চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পেলে কূটনৈতিক দর-কষাকষিতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো অনেক বেশি চাপ তৈরি করতে সক্ষম হয় এবং তারা নিজেদের স্বার্থ খুব সহজে নিশ্চিত করতে পারে। গণতন্ত্র সংকটের মধ্যে থাকলে ক্ষমতাসীন সরকারি দলের জন্য সব সময় এক ধরনের বৈধতার সংকটের ঝুঁকি থাকে–অন্তত জনসমর্থনের প্রেক্ষাপটে। কোন সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির নিরিখে বৈধতার সংকট থাকলে তাদের একটা চেষ্টা থাকে বাইরের রাষ্ট্রের সমর্থন নিশ্চিত করা। এতে যেই সরকার ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তারা তাদের জাতীয় স্বার্থ আদায়ের ক্ষেত্রে ততটাই দুর্বল অবস্থানে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রভাবশালী বিদেশি রাষ্ট্রসমূহ ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন দেয়ার বিনিময়ে তাদের নিজেদের স্বার্থটা কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে সমর্থ হয়। আর ওই জন্য বৈধতার সংকট কাটাতে জনমানুষের স্বার্থ নির্ভর রাজনীতি না করলে আন্তর্জাতিক দর-কষাকষিতেও নিজেদের অবস্থানটা শক্তিশালী থাকে না। গণতন্ত্রের চর্চাটা ওইভাবে শক্তিশালী হলে বা গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে জনমতের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকাটাও সহজ হয় বহুলাংশে।

তাই যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, ভারত ও চীনের

সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, তার ওপরই আসলে নির্ভর করছে কে ক্ষমতায় থাকবে বা কারা ক্ষমতায় আসতে পারবে ভবিষ্যতে। আর এই ভারসাম্য নিশ্চিত করার দক্ষতাটা যে যত বেশি নিশ্চিত করতে পারবে, তার ততটা ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দেশে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় চীন-ভারতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে শক্তিশালী করা খুব জরুরি। একই সাথে আমাদের আমলাতন্ত্র এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে সেখানে একমাত্র ব্যক্তিই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ামক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্ত্রণালয়গুলো স্বাধীনভাবে, স্বকীয়তার সাথে কাজ করতে পারছে কি না, তা এখন গবেষণার বিষয়।

এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন–সবকিছু পুরোমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়লে কূটনৈতিক দর-কষাকষিতে যে কোন রাষ্ট্রের অবস্থানই সাধারণত অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সামর্থ্যও স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। স্বাধীনভাবে, স্বকীয়তার সাথে কাজ করতে সক্ষম না হলে আমলাতন্ত্র তাদের পেশাদারত্ব, দক্ষতা বা নিপুণতার প্রমাণ রাখতে পারে না। অথচ এটাই সবচাইতে বেশি প্রয়োজন ভারত-চীনের সাথে দর-কষাকষিতে আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য।

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান: লেখক, গবেষক ও অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: tanzim04@gmail.com

তথ্যপুঞ্জি

[ঝেং ও জিয়াং, 2019] Zheng, Lu & Xiang, Deng (2011). China's Western Development Strategy: Policies, Effects and Prospects. Department of Economics, Sabanci University, Turkey, School of Economics, Sichuan University, P.R.China. Available at ttps://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=China's+Western+Development+Strategy%3APolicies%2C+Effects+and+Prospects. Accessed on 11 January 2020.

[এডিবি, ২০১৭] Asian Development Bank (2017). Meeting Asia's Infrastructure Needs. Manila: ADB.

[লিয়াং, ২০১৯] Lyang, Wei (2019). "China and the 'Belt and Road Initiative' (BRI): Contested Multilateralism and Innovative Institution-Building". In Ka Zeng (ed.), *Handbook on the International Political Economy of China.* Cheltenham, UK: Edgar Elgar Publishing Limited. Pp. 361-376.

[রয়টার্স, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯] Reuters (27 September 2019). 'China's current account likely to maintain small surplus in 2019: FX regulator'. Available at https://www.reuters.com/article/us-china-economy-currentaccount/chinas-current-account-likely-to-maintain-small-surplus-in-2019-fx-regulator-idUSKBN1WC12V. Accessed on 11 January 2020.

[দ্য স্টেট কাউন্সিল অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব চায়না, ২০১৫] The State Council of the People's Republic of China (2015). Full Text: Report on the Work of the Government. Available at http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/05/content_281475066179954.htm. Accessed on 24 December 2019.

[বাজপেয়ী, ২০১৪] Bajpaee, Chietigj (2014). 'Commentary: An Asia for Asians, the birth of a multipolar Asia?'. CNA. Available at https://www.channelnewsasia.com/news/asia/commentary-an-asia-for-asians-the-birth-of-a-multipolar-asia-8872350. Accessed on 7 December 2019.

[চ্যাটফস্ক ও ম্যাক ব্রাইড, ২১ মে ২০১৯] Chatzky, Andrew & McBride, James (21May 2019). "China's Massive Belt and Road Initiative". Council on Foreign Relations. Available at https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative. Accessed on 4 December 2019.

[যেঙ্গারলে, ৪ অক্টোবর ২০১৮] Zengerle, Patricia (4 October 2018). 'Congress, Eying China, Votes to Overhaul Development Finance'. The Reuters. Available at https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-development/congress-eying-china-votes-to-overhaul-development-finance-idUSKCN1MD2HJ. Accessed on 23 November 2019.

[পিলিং ও পলিটি, ৪ অক্টোবর ২০১৮] Pilling, David & Politi, James (4 October 2018). 'US Senate Passes $60bn Foreign Development Bill'. The Financial Times. Available at https://www.ft.com/content/14400aa2-c743-11e8-ba8f-ee390057b8c9. Accessed on 23 November 2019.

[পান্ডে, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯] Panda, Ankit (19 January 2019). "What ARIA Will and Won't Do for the US in Asia". The Diplomat. Available at https://thediplomat.com/2019/01/what-aria-will-and-wont-do-for-the-us-in-asia/. Accessed on 12 December 2019.

[দত্ত, ১৫ জুন ২০১৭] Dutta, Prabhash K (15 June 2017). 'Can China really encircle India with its String of Pearls? The great game of Asia'. The India Today. Available at https://www.indiatoday.in/india/story/china-encircle-india-string-of-pearls-982930-2017-06-15. Accessed on 19 December 2019.

[ডেভারমন্ট, ৪ জুন ২০১৯] Devermont, Judd (4 June 2019). 'Assessing the Risks of Chinese Investments in Sub-Saharan African Ports'. Center for Strategic and International Studies. Available at https://www.csis.org/people/judd-devermont. Accessed on 11 November 2019.

[পমনন, ৬ এপ্রিল ২০১৮] Menon, Rhea (6 April 2018). "Thailand's Kra Canal: China's Way Around the Malacca Strait". The Diplomat. Available at https://thediplomat.com/2018/04/thailands-kra-canal-chinas-way-around-the-malacca-strait/. Accessed on 11 January 2020.

[evoyqv, 2018, c„ôv-23] Baruah, Darshana M.(21 August 2018). "India's Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia". Carnegie India. Available at https://carnegieindia.org/2018/08/21/india-s-answer-to-belt-and-road-road-map-for-south-asia-pub-77071. Accessed on 2 December 2019.

[দ্য হিন্দু বিজনেসলাইন, ৯ জুন ২০১৯] The Hindu Businessline (9 June 2019). 'PM Modi, Prez Solih inaugurate coastal surveillance radar system built by India'. Available at https://www.thehindubusinessline.com/news/pm-modi-prez-solih-inaugurate-coastal-surveillance-radar-system-built-by-india/article27702761.ece. Accessed on 11 January 2020.

[কাপুর, ৩ জুন ২০১৯] Kapur, Lalit (3 June 2019). 'An Indian Ocean Agenda for Modi 2.0'. Asia Martime Transparency Initiative. Available at https://amti.csis.org/an-indian-ocean-agenda-for-modi-2-0/. Accessed on 11 January 2020.

[লিয়াও, ১৭ এপ্রিল ২০১৮] Liao, Tim (17 April 2018). 'Why China, Japan and Korea Fuss over Tiny Islands—4 Things to Know'. The Washington Post. Available at https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/17/why-japan-is-making-a-big-fuss-over-tiny-islands

-4-things-to-know/. Accessed on 5 January 2020.

[দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৫ মে ২০১৭] The Times of India (25 May 2017). 'Asia-Africa growth corridor launched'. Available at https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/asia-africa-growth-corridor-launched/articleshow/58830900.cms. Accessed on 2 December 2019.

[কয়নে, ২৩ এপ্রিল ২০১৮] Coyne, Andz (23 April 2018). 'Japan's Nissin Foods enters into Hong Kong JV with Kagome Co.' Just-Food. Available at https://www.just-food.com/news/japans-nissin-foods-enters-into-hong-kong-jv-with-kagome-co_id139113.aspx. Accessed on 3 November 2019.

[জিনহুয়া, ২৬ অক্টোবর ২০১৮] Xinhua (26 October 2018) 'China, Japan Sign Currency Swap Deal'. Available at http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/26/c_137560512.htm. Accessed on 2 January 2020.

[ব্রুস্টার, ২০১৮] Brester, David (2018). 'The MSRI and the Evolving Naval Balance in the Indian Ocean'. In Jean-Marc F. Blanchard (ed.), China's Maritime Silk Road Initiative and South Asia: A Political Economic Analysis of its Purposes, Perils, and Promise. Singapore: Palgrave Mcmillan. Pp. 55-80.

প্রথম আলো (১৪ অক্টোবর ২০১৬). 'যেসব চুক্তি ও সমঝোতা হলো চীনা প্রেসিডেন্টের সফরে'। পাওয়া যাবে https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/999963| দেখা হয়েছিল ৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

[দ্য ডেলি স্টার, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮] The Daily Star (31 December 2018). "Chinese president, PM greet Sheikh Hasina on AL's landslide victory". Available at https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/chinese-president-pm-greet-prime-minister-sheikh-hasina-awami-league-landslide-victory-1681162. Accessed on 3 December 2019.

[মাহমুদ, ২৩ জুলাই ২০১৯] Mahmud, Arshad (23 July 2019). "New Bangladesh Sub Base Could Revive India Tensions: Not part of China's 'string of pearls' in Dhaka's View". The Asian Times. Available at https://www.asiatimes.com/2019/07/article/new-bangladesh-submarine-base-could-revive-tensions-with-india/. Accessed on 4 December 2019.

[রাঘুভানফশ, ২০১৬] Raghvuanshi, Vivek (2016). Purchase of Chinese Subs by Bangladesh 'An Act of Provocation' Toward India. The Defence News. Available at https://www.defensenews.com/naval/2016/11/23/purchase-of-chinese-subs-by-bangladesh-an-act-of-provocation-toward-india/. Accessed on 29 November 2019.

[মোরামুডালি, ১৪ মে ২০১৯] Moramudali, Umesh (14 May 2019)..."Is Sri Lanka Really a Victim of China's 'Debt Trap?" The Diplomat. Available at https://thediplomat.com/2019/05/is-sri-lanka-really-a-victim-of-chinas-debt-trap/. Accessed on 11 January 2020.

[গ্রিন ওয়ারিয়রস, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯] Green Warriors (17 January 2019). "China Takes Over Zambia's Airport, National Broadcasting Corporation and ZESCO Power Plant". Available at https://greenworldwarriors.com/2019/01/17/china-takes-over-zambias-airport-national-broadcasting-cooperation-and-zesco-power-plant/. Accessed on 10January 2020.

[মাডোও, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮] Madowo, Larry (3 September 2018). 'Should Africa be wary of Chinese debt?'. The BBC. Available at https://www.bbc.com/news/world-africa-45368092. Accessed on 3 December 2019.

[জয়ারাম, কাসিরি ও সান, জুন ২০১৭] Jayaram, Kartik , Kassiri, Omid & Sun, Irene Yuan 'The Closest Look yet at Chinese Economic Engagement in Africa'. McKinsey & Company. Available at https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa. Accessed on 2 December 2019.

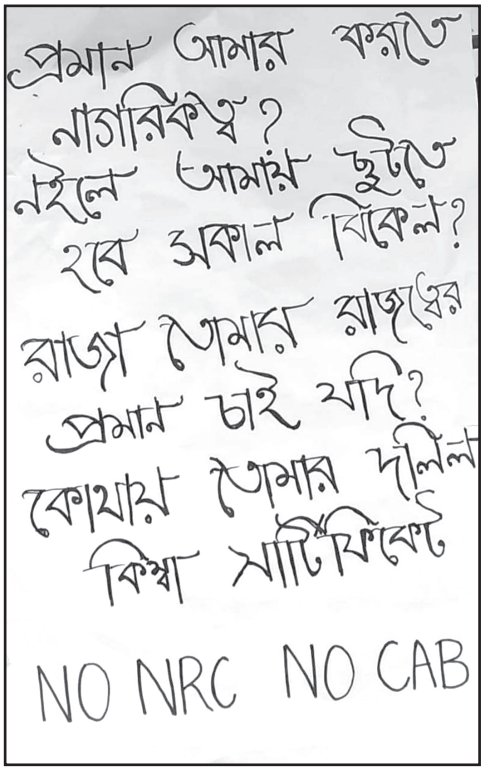

ভারতের গণআন্দোলনে পোস্টার: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত